রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা

শিবনারায়ণ রায়

রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় বহুমুখী-প্রতিভা বাংলার সাংস্কৃতিকে বিচিত্র ভাবে পুষ্ট করেছে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিই মুখ্যত তাঁর গান এবং নৃত্যনাট্যের অনুরাগী। তিনি যে এরজন বহুবিদ্য ভাবুক ছিলেন, তাঁর রচনাবলীর প্রায় অর্ধেক জুড়ে বিচিত্র বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ—ইতিহাস, শব্দতত্ত্ব, ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ নীতি, শিক্ষা, কত বিষয় নিয়েই না তাঁর নিজস্ব চিন্তা বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে— তার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠক-পাঠিকার পরিচয় নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই অনীহা এবং অজ্ঞতার ফলে শিক্ষিত বাঙালি পাঠক - পাঠিকার পরিচয় নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই অনীহা এবং অজ্ঞতার ফলে বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালি জাতির সবিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

মানুষের ভাগ্য এবং সে কারণে মানুষের ইতিহাস পূর্বনিয়ন্ত্রিত এই মূঢ় ধারণা দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধর্ম বিশ্বাসপুষ্ট নিয়তিবাদের সঙ্গে আধুনিককালে যোগ দিয়েছিল ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদ। স্বাধীনতার সামর্থ্য নিয়েই মানুষ যে পৃথিবীতে এসেছে। মানবতন্ত্রী প্রত্যয় এ দেশের সমাজ সংস্কৃতিতে এবং তাবৎ শেকড় ছড়াতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই এই মানবতন্ত্রী ধারণা তার চিত্তে এবং চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল। নিজে যেহেতু শিল্পী এবং স্রষ্টা তাঁর মনে সহজেই এ সত্য প্রতিভাত হয়েছিল যে যা অতীতে ছিল বা বর্তমানে আছে তাকেই চরম এবং অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে রচনা করে এবং এই ভাবে প্রাজাতিক ইতিহাস রচনায় তার বিশেষ ভূমিকা আছে, রেনেসাঁসের এই মূল প্রত্যয় তাঁর জীবন এবং দর্শনকে কখনো স্থবির হতে দেয় নি।

বর্তমান সমাজ, তার ক্ষতিকর প্রবল ধারা, তার কাম্য বিকল্পের দিকে মোড় ফেরানো—এ সব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজীবন চিন্তা করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে খুবই অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশ শতকের আরো দুজন প্রধান ভারতীয় ভাবুকের পরিণত সমাজচিন্তার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাই। অপ্রত্যাশিত ভাবে কারণ এই তিন জনের ব্যক্তিত্বের গঠনে এবং জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে পার্থক্য খুবই প্রকট। তা সত্ত্বেও তাঁদের পরিণত সমাজচিন্তায় গভীর মিল আছে এবং এ সম্পর্কে আমি ইংরেজিতে অন্যত্র আলোচনা করেছি : (Three Twentieth century Utopians : Tagore, Gandhi and Roy : gandhiar Perspectives)। এখানে আমি শুধু সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার দু-একটি বিশিষ্ট দিকের উল্লেখ করব। যাঁরা এ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে চান তাঁদের রবীন্দ্রনাথের লেখা এই বইগুলি অতি অবশ্যই পড়তে হবে : আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজা ও প্রজা (১৯০৮), স্বদেশ, সমাজ (১৯০৮), Nationalism (1917), Creative unity (1922), কালান্তর (১৯৩৭) এবং সভ্যতার সংকট (১৯৪১)।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে তার স্রষ্টার পক্ষে ঘোরতর বিপদ হয়ে উঠেছিল। সম্পদ সংগ্রহ ও ক্ষমতা দখলকে তার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে, আধুনিক সভ্যতা স্ত্রী-পুরুষকে এমন এক-বোধে (one Dimensional) ব্যক্তিতে পর্যবসিত করতে চেয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের থেকে এবং অপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যাকে প্রায় যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করা যায়। যে প্রবণতার তিনি প্রবল বিরোধী তা হল কেন্দ্রীভবনের দিকে প্রবণতা, সে প্রবণতা রাজনীতিতেই হোক, আর অর্থনীতি বা সমাজ সাংস্কৃতিক জীবনকেই হোক। সম্ভবত: সভ্যসমাজে বরাবরই এই প্রবণতা ছিল, কিন্তু শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে তা এক ভীতিকর গতিবেগ সংগ্রহ করেছে। তাঁর মতে যদি মানুষ যন্ত্রে পরিণত হতে, অথবা বিচারবুদ্ধি হীন উপাদান মাত্রে রূপান্তরিত হতে না চায়, তবে এই প্রবণতাকে থামাতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই মনে করতেন এই প্রবণতা আধুনিক সভ্যতায় যত শক্তিশালীই হোক, কোন মতেই তা অনিবার্য নয়। ঐতিহাসিক বা সামাজিক অনিবার্যতার তথাকথিত তত্ত্বের উদ্ভব এক ভ্রান্ত ধারণা থেকে, ভৌত বিজ্ঞানের নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তির বিকাশ এবং সমাজ-বিবর্তনের এক ভ্রান্ত সাদৃশ্যতত্ত্ব থেকে। আসলে মানুষের নিজের ভিতরেই সেই সম্পদ আছে যা প্রযুক্ত হলে সামাজিক বিকাশের গতি বদলে দিতে পারে এবং মানুষের মূল প্রয়োজনের পক্ষে আরো উপযুক্ত বিকল্প জীবনপ্রণালী তৈরী করতে পারে। তিনি আধুনিক সভ্যতার ভয়ংকর বৈপরীত্যগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে ব্যক্তি ক্ষুদ্র অনুতে পরিণত হয়ে শেষে এক জড় সামূহিকতার মধ্যে বিলুপ্ত হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তাদের বুঝিবা বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে তাদের কোন অংশ থাকছে না। তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকজন চতুর ক্ষমতাবান হৃদয়হীন এক-বোধ সম্পন্ন মানুষ। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের শ্রম আরও বেশী উৎপাদন দিচ্ছে, কিন্তু তা ক্রমেই নিরর্থকও নিরানন্দ হয়ে পড়ছে। জীবন যত এক ছাদে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে, তত অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব বাড়ছে। আধুনিক সভ্যতার এই মূলগত সমস্যাগুলির উপরে অনেক আগেই তিনি আলোকপাত করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে এ বৈপরীত্যের সমাধান মানুষের সাধ্যায়ত্ত। প্রকৃষ্টতর বিকল্পের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে যদি ব্যক্তিরা তাদের বিবেকবুদ্ধিবিমুখ প্রবণতাগুলিকে অপ্রতিরোধ্য বলে মেনে নেওয়ার বদলে নিজেদের অন্তর্নিহিত সৃজনশীল এবং সহযোগধর্মী প্রবণতা দ্বারা চালিত হতে প্রস্তুত থাকে।

যে বিকল্প সমাজের তিনি কল্পনা করেছিলেন তাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর দ্ব্যর্থহীন গুরুত্ব দেওয়া গণতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সমন্বয় এই গণতন্ত্রগুলির আকার ও গঠন এমন হবে, যেখানে সব সদস্য প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ভাবে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। সেই প্রস্তাবিত সমাজ হবে বহু তৃণমূল (Grassroots) গণতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সমন্বয়; এই গণতন্ত্রগুলির আকার ও গঠন এমন হবে, যেখানে সব সদস্য প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ভাবে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। সমাজ-জীবনের প্রকৃত মূল কাজগুলি— যেমন সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা, দ্বন্দ্বের নিরসন ও ন্যায় বিচার— এগুলি হবে সমগ্র স্থানীয় সংগঠনের কাজ। এই সংগঠন সর্বসম্মতির ভিত্তিতে কাজ করবে, এবং সেই সঙ্গে যে সব মতপার্থক্য সরকরি সংগঠন বা তার সদস্যদের ক্ষতি করছে না, সেগুলিকে রক্ষা ও সম্মান করবে। এই তৃণমূল গণতন্ত্রগুলি একে অপরের কাছে মুক্তদ্বার থাকবে। পরস্পরের বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে স্তরবিন্যাস গড়ে উঠবে, সেগুলির শুধু সীমিত সমন্বয়ী ভূমিকা থাকবে; ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ক্ষমতা হবে খুবই সীমিত। এমন একটা সমাজ তখনই বিকাশলাভ করতে পারে, যখন কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, অথবা তীব্র অস্থিরতা ও দ্বন্দ্বের উপর নির্ভরশীল, প্রতিষ্টানগুলির প্রভাব এবং ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পাবে।

অর্থনীতিতে তিনি লাভের জন্য উৎপাদনের বদলে প্রয়োজনের জন্য উৎপাদনের প্রস্তাব করেছিলেন। সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন সম্পদের সমবায়িক পরিচালন ও পূর্ণ ব্যবহার, ছোট কিন্তু কার্যকরী ইউনিটসমূহের একটি সক্রিয় কাঠামো গড়ে তোলা যেখানে উৎপাদনের নিযুক্ত লোকেরা তাদের কাজে একটা পূর্ণতার বোধ খুঁজে পাবে। প্রতিযোগিতা, এবং একচেটিয়া ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রত্যাখ্যান করে তিনি উন্নয়নের একটা বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবছিলেন যেখানে শ্রমিক প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সমাজের প্রকৃত অনুভূত প্রয়োজনগুলি মেটার জন্য প্রযুক্তিকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগাবে। সংগঠনের দৈত্যাকৃতি, যন্ত্রের দুর্বোধ্য জটিলতা, ও দ্রুত শহরায়ণের দিকে যে সমসাময়িক ঝোঁক, তার বিরুদ্ধে তিনি একটা দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছিলেন— একটা নতুন দুনিয়ার সম্ভাবনা, যেখানে ক্ষুদ্রই সুন্দর বলে স্বীকৃতি পাবে, যেখানে যন্ত্র মানুষের অধীন হবে, যেখানে সমৃদ্ধিশীল ও সুসমঞ্জস গোষ্ঠীসমূহের বিচিত্র সম্বন্ধবিস্তার জায়গা নেয় আজকের ভীড়াক্রান্ত শহর ও বদ্ধ গ্রামের।

এই আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার জন্য চাই সেই সব আত্ম-প্রশিক্ষণরত স্ত্রী-পুরুষ যাঁরা স্বেচ্ছায় এই সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। এই স্বেচ্ছাসেবীদের আত্ম-প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকবে বিবেক ও বোধশক্তির বিকাশ, অপরের জন্য চিন্তা ও সেবা-সহযোগিতার মনোভাব, সেই সঙ্গে ক্ষমতার আকাঙ্খা বর্জন, দল ও ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্খা ত্যাগ, ভয়, অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্য থেকে মনের মুক্তি। তাঁদের এমন এক বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবার জন্য। নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যে ব্যক্তিত্ব বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এই ভাবে অপরের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। যে মানুষের নির্ভেজাল স্বার্থ-চিন্তা অথবা প্রতিযোগিতামূলক গোষ্ঠী অনুগত্যের জালে বন্দী তাদের পক্ষে এ কাজে ব্রতী হবে আগে নিজেদের চরিত্রের রূপান্তর সাধন জরুরি। শুধুমাত্র বিকাশমান নৈতিক দৃষ্টি ও প্রাণশক্তিসম্পূন্ন নরনারীই সেই গতিসঞ্চার করতে পারে যা সমাজকে এক নৈতিক ও সুষম ব্যবস্থার কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারবে। বিবেকবান ব্যক্তিত্ব হবার ফলে তাদের জড়ীভূত সমূহের মধ্যে শুষে ফেলা যায় না। তার রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারে না, যেহেতু দলগুলি স্বভাবতই ক্ষমতা দখলের কাজে নিয়োজিত, এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিজে নিজে সংগঠনের একপেশে মতামত ও স্বার্থের অধীন করতে চায়। তার বদলে, এই ধরণের ব্যক্তিদের সভাগুলি এমন হবে, যা একটা মুক্ত ও সহযোগিতাবাদী সমাজের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই ধরনের ব্যক্তি ও তাদের সভা থেকে জন্ম নেবে এক আন্দোলন, যার অভিমুখ্য হবে এক নৈতিকভাবে কাম্য সমাজ। এই বিকাশের পিছনে যে পদ্ধতি কাজ করবে তা এমন হবে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতা ভোগ করবার বা সম্পদ সঞ্চয় করবার ইচ্ছাই হবে না; এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানও থাকবে না যেখানেক্ষমতা বা সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যে বিকেন্দ্রিত সমাজের ছবি দেখেছিলেন তার প্রতি আমি গভীর আকর্ষণ বোধ করি। এটির একটা বৈশ্বিক তাৎপর্য আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের ক্ষেত্রেও তার একটা বিশেষ প্রাসঙ্গিক কতা আছে। বিচ্ছিন্নতা ও যান্ত্রিক জীবন, খন্ডতা ও গণপিন্ডায়ণ, ক্ষমতা-কেন্দ্রীভবনের চেষ্টা ও ঠান্ডা লড়াই—এ গুলি আজ সারা বিশ্বের সমস্যা; এবং যে সব বিকল্প - সম্ভাবনার মধ্যে কাম্য প্রকৃষ্ট জীবনযাত্রার সন্ধান আছে, হিংসা বা পীড়ন ছাড়াই যে বিকল্পের সাধনা সম্ভব, স্পষ্টতই আমাদের কাছে তার তাৎপর্য বিরাট। ভারতে, স্বাধীনতার পর থেকে, আমরা দেখেছি বড় শহরে নিঃসঙ্গ ভীড় ও গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ সর্বহারার দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি, সম্পদের মেরুকরণ, বেকারী ও অর্থ বেকারীর প্রবল বৃদ্ধি, শিক্ষিত লোকের মানসিক পঙ্গুত্ব, এবং মানবিক বন্ধন ও আবেগের অবক্ষয়— এক বিষণ্ন দৃশ্যপট— শিল্পায়িত সমাজগুলি ইতিমধ্যেই যে দৃশ্যের সঙ্গে বহু দুঃখে পরিচিত— তারই এক পুনরাবৃত্তি। তবে ভারতের রাষ্ট্রিকতা, কেন্দ্রিকতা, দানবীয় বিশালতা ও প্রযুক্তিতন্ত্র এখনও অপর কয়েকটি দেশের মত দৃঢ়মূল হয়নি, এবং এমনকি এই পর্যায়েও বিকেন্দ্রিক বিকল্পের সাধনার সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশী। আমাদের বর্তমান বিধ্বংসী স্রোতের বিকল্প সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার অনেক কিছু দেবার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।